বাংলাদেশে গবাদি প্রাণীর নতুন রোগ

লাম্পি স্কিন ডিজিজ (Lumpy Skin Disease)

বাংলাদেশে লাম্পি স্কিন রোগ অনুসন্ধান প্রকল্প

প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা।

ভূমিকা

লাম্পি স্কিন ডিজিজ (এল এস ডি) আমাদের দেশে ২০১৯ সালের মার্চ-এপ্রিল মাস হতে প্রথমে চট্টগ্রাম অঞ্চলে সংক্রমণের খবর পাওয়া যাচ্ছিল এবং পরবর্তীতে ২-৩ মাসের মধ্যে সারা দেশের গবাদি প্রাণীতে রোগটি ছড়িয়ে পড়ে। এটি একটি ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট মারাত্মক চর্মরোগ। রোগটি সংক্ষেপে এলএসডি বা চামড়ার পিন্ড রোগ বা ফোস্কা রোগ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। কোন কোন অঞ্চলে এই রোগে গরুর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। রোগটি গত জুলাই আগস্ট মাসে চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, যশোর, ঝিনাইদহ ও শরীয়তপুরসহ বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা এই রোগের নমুনা সংগ্রহ করে PCR পরীক্ষার মাধ্যমে রোগটিকে লাম্পি স্কিন ডিজিজ হিসাবে সনাক্ত করে। কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত এই রোগটি প্রাণিসম্পদ বিজ্ঞানীদের কাছে আফ্রিকার গবাদি প্রাণীর রোগ হিসাবে পরিচিত ছিল। তবে সম্প্রতি রোগটি চীন, কাজাকিস্তানসহ মধ্য এশিয়ার কয়েকটি দেশে এবং অতি সম্প্রতি ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে পাওয়া যাওয়ায় এবং ঐ অঞ্চলের বিজ্ঞানীদের মধ্যে সতর্ক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। রোগটি যদিও OIE এর নিকট রিপোর্ট করার বিধান আছে তবুও বিভিন্ন দেশ OIE কে রিপোর্ট করতে বেশ কিছু সময় নেয়। ফলে রোগটি বিভিন্ন দেশে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ছে।

রোগের ইতিহাস

লাম্পি স্কিন ডিজিজ মূলত আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক বার মহামারী আকারে দেখা গেলেও ভারতীয় উপমহাদেশে রোগটি বিরল রোগ হিসাবে চিহ্নিত ছিল। ১৯২৯ সালে রোগটি প্রথম আফ্রিকার জাম্বিয়াতে দেখা যায় যা পরবর্তীতে ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে এই মহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এই রোগের প্রাদুর্ভাবের ফলে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার গরু আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এবং শত শত খামার ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। সত্তর ও আশির দশকে আফ্রিকার প্রায় সব দেশের গরু এ রোগে আক্রান্ত হয়। লাম্পি স্কিন ডিজিজ (এল এস ডি) আফ্রিকার গবাদি প্রাণীর endemic (নিয়মিত সংক্রমণ) রোগ হিসাবে পরিচিত ছিল। ২০১৩ সালে রোগটি প্রথম তুরস্কে এবং পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে মধ্য এশিয়ার কিছু অঞ্চলে এর প্রাদুর্ভাব ঘটে। মূলত রোগাক্রান্ত প্রাণী এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে পরিবহনের মাধ্যমে রোগটি ছড়ায় বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

চিত্র-০১ ঃ চামড়ায় প্রচুর গুটির লক্ষণ ও গুটি ফেটে ক্ষত সৃষ্টি হয়

রোগের কারণ

এলএসডি একটি ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট চর্মরোগ, যা গবাদি প্রাণীর জন্য প্রাণঘাতী রোগ। রোগটি আফ্রিকায় এবং পরবর্তীতে তুরস্কের খামারের জন্য ব্যাপক ক্ষতির কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। রোগটি মূলত লাম্পি স্কিন ডিজিজ ভাইরাস (LSDV) দ্বারা হয় যা কেপরিপক্স ভাইরাস (Capripox virus) জেনাসের অন্তর্ভুক্ত। যখন এই ভাইরাস ছাগলে সংক্রামিত হয় তখন বলা হয় গোট পক্স আবার যখন ভেড়ায় সংক্রামিত হয় তখন বলা হয় শীপ পক্স। গরুতে এই ভাইরাস সংক্রামিত হলে রোগটিকে লাম্পি স্কিন ডিজিজ (এল এস ডি) বলা হয়। প্রথমত এই রোগটি মশা-মাছি, রক্ত চোষা আঁঠালী বা মাইট দ্বারা আক্রান্ত প্রাণী হতে অন্য প্রাণীতে ছড়ায়। আক্রান্ত প্রাণীর লালা, দুধ, নাকের ডিসচার্জ (Nasal discharge) এবং সিমেন (Semen) এর মাধ্যমেও রোগটি ছড়াতে পারে।

রোগের লক্ষণ

ক) আক্রান্ত গরুর প্রথমে জ্বর হয় যা ১০৪° থেকে ১০৫° ফাঃ হতে পারে এবং একই সাথে ক্ষুধামন্দা দেখা যায়। জ্বরের সাথে নাক-মুখ দিয়ে তরল পদার্থ বের হয়।

খ) গরুর শরীরের লিম্ফনোডগুলির আকার বেড়ে যায়। প্রাণীর চামড়ার নিচে ফোস্কা বা গুটি দেখা যায়। ফোস্কা থেকে লোম উঠে যায় এবং ক্ষত সৃষ্টি হয়।

গ) আক্রান্ত প্রাণীর চোখ দিয়ে পানি পড়ে। চোখ লাল হয়ে যায় এবং চোখের কর্নিয়া ঘোলা হয়ে যেতে পারে।

ঘ) আক্রান্ত প্রাণীর মুখে ও পায়ে ক্ষত হয়। প্রাণীর চলাফেরা এবং খাদ্য গ্রহণে সমস্যা হতে পারে।

ঙ) আক্রান্ত প্রাণীটি দিন দিন দুর্বল হয়ে যায়। রক্ত শূন্যতাসহ বিভিন্ন অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দেয়। এই রোগে আক্রান্তের হার (Morbidity) অনেক বেশী হলেও ভাল খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৃত্যুর (Mortality) হার কমানো সম্ভব।

চ) আক্রান্ত গাভীর দুধের উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে যাওয়া, গর্ভপাত হওয়া, বন্ধ্যাত্বসহ ওজন অনেকাংশে কমে যায়। এ ছাড়াও এই রোগে প্রাণীর চামড়ার মান অত্যন্ত খারাপ হওয়ার কারণে এই রোগে খামারীর ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়ে থাকে।

পোস্টমর্টেম লক্ষণ

১. খাদ্য নালী, শ্বাসনালী, প্রজনন নালীর প্রাচীরে বৃত্তাকার, সামান্য উঁচু, নরম ব্যথাযুক্ত গুটি পাওয়া যায়।

২. লিম্ফনোড (Lymphnode) সমূহ ফুলে যায়।

৩. ওলান ও বক্ষদেশে প্রচুর (ইডিমেটাস) তরল পাওয়া যায়।

নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষণাগারে প্রেরণ

আক্রান্ত প্রাণীর সঠিক রোগ সনাক্তকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

ক) পিসিআর (PCR) পরীক্ষা জন্য সাধারণত আক্রান্ত স্থানের সোয়াব এবং আক্রান্ত স্থান থেকে টিস্যু নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

খ) সিরাম (Serum) নমুনা দ্বারা ভাইরাসের এন্টিবডি সনাক্ত করা যায়।

গ) সংগৃহীত নমুনা স্বল্প সময়ের জন্য -২০° সে. তাপমাত্রায় এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য -৮০° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়।

ঘ) নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণ করার সময় বরফ সহকারে কুলবক্স করে প্রেরণ করতে হবে।

চিত্র-৪ঃ নমুনা সংগ্রহ

রোগটি ছড়ানোর উপায়

ক) আক্রান্ত প্রাণী এক স্থান হতে অন্য স্থানে পরিবহনের মাধ্যমে রোগটি ব্যাপকভাবে ছড়াতে পারে।

খ) রক্ত চোষা মাছি, মশা বা আটালীর মাধ্যমে রোগটি দ্রুত এক প্রাণী হতে অন্য প্রাণীতে ছড়িয়ে যেতে পারে।

গ) এ ছাড়াও আক্রান্ত প্রাণীর লালা এবং দুধ ও আক্রান্ত ষাঁড়ের সিমেন এর মাধ্যমেও রোগটি ছড়াতে পারে।

ঘ) আক্রান্ত প্রাণী পরিচর্যাকারী, চিকিৎসক বা ভ্যাক্সিন প্রদানকারীর মাধ্যমেও রোগটি অন্য সুস্থ প্রাণীতে ছড়াতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ

আমাদের দেশে পূর্বে এই রোগের এত ব্যাপক প্রাদুর্ভাবের কোন তথ্য নাই। এই কারণে রোগটি প্রতিরোধে আমাদের কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না। যে সকল দেশে রোগটি নিয়মিত সংক্রমণ বা endemic সে সকল দেশে এই রোগটি নিয়ন্ত্রণের জন্য LSD ভ্যাক্সিন ব্যবহার করা হয়। তবে এই রোগের ভাইরাস গোট পক্স বা শীপ পক্স ভাইরাসের পরিবারভুক্ত হওয়ায় গোট পক্স বা শীপ পক্স ভ্যাক্সিন দ্বারা রোগটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

মধ্যপ্রাচ্যের গরুতে শীপ পক্স ভ্যাক্সিন ১০ গুণ বেশী হারে ব্যবহার করা হয়। তবে বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে গরুর ওজন এর উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা ৩ থেকে ১০ গুণ বেশী হারে শীপ পক্স বা গোট পক্স ভ্যাক্সিন দেয়ার পরামর্শ প্রদান করেছেন। আক্রান্ত অঞ্চলে প্রাণীর চলাচল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করা যায়। তবে endemic নয় এমন কিছু উন্নত দেশে রোগটি প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করার পর পরই আক্রান্ত প্রাণীকে ধ্বংস করে রোগটি দ্রুত নির্মূল করে থাকে।

এ ছাড়াও উত্তম খামার ব্যবস্থাপনা (Good farm practice) এর মাধ্যমে রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। যেমন-

ক) খামার ও এর আশ পাশের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার মাধ্যমে রক্ত চোষা মশা-মাছি নিয়ন্ত্রণ করা।

খ) খামারে প্রাণীর জন্য মশারির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে LSD ছাড়াও অন্যান্য রক্ত বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

গ) আক্রান্ত প্রাণী দ্রুত অন্যান্য স্থানে সরিয়ে (Quarantine) পৃথকভাবে চিকিৎসা ও পরিচর্যা করা।

ঘ) আক্রান্ত প্রাণীর উচ্ছিষ্ট খাবার প্রাণী সুস্থ প্রাণীর সংস্পর্শে না এনে বিধিমত নষ্ট করা।

ঙ) আক্রান্ত খামারে সর্বসাধারণের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত চারণ ভূমিতে প্রাণী না নেয়া।

চিকিৎসা

রোগটি ভাইরাস এর কারণে হয় বিধায় ফলপ্রসূ তেমন ভাল চিকিৎসা নাই। তবে রোগের লক্ষণ বিবেচনা করে চিকিৎসা প্রদান করা প্রাণী দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। এই রোগে প্রাণী অত্যন্ত দূর্বল হয়ে যায় এবং প্রাণীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়।

(১) আক্রান্ত প্রাণীর ফোস্কা বা গুটি ফেঁটে গেলে Povisep solution বা আয়োডিন মিশ্রণ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

(২) ফোস্কাগুলি না ফাটলে ঐ গুলির উপর (চামড়ার উপরে) Povisep solution বা আয়োডিন দিয়ে রং এর মত প্রলেপ দেয়া যায়।

(৩) আক্রান্ত প্রাণীকে প্রচুর পানি বা চিটা গুড়ের সরবত খাওয়াতে হবে।

(৪) বিভিন্ন মিনারেল মিশ্রণ যেমন- ফেরাস সালফেট, কপার সালফেট, কোবাল্ট মিশ্রণ, জিংক মিশ্রণ খাওয়াতে হবে।

(৫) ভিটামিন-বি ইনজেকশনের মাধ্যমে এবং এন্টিহিসটামিন (Antihistamin), ব্যথানাশক (Painkiller), এন্টিপাইরেটিক (Antipyretic) ঔষধ প্রাণীকে দিতে হবে। প্রয়োজন হলে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে।

ইম্মিউন সিরাম চিকিৎসা

ইম্মিউন সিরাম চিকিৎসা পদ্ধতিটি এই রোগ প্রতিকারের একটি অত্যন্ত কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসায় সফলতার শতকরা হার ৫০ হতে ৯০ ভাগ। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ইম্মিউন সিরাম লাম্পি স্কিন ডিজিজ (এল এস ডি) রোগ হতে সুস্থ হয়ে ওঠা প্রাণী হতে সংগ্রহ করে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রাণীর ওজন অনুযায়ী ৫-১০ সিসি ইম্মিউন সিরাম রোগাক্রান্ত গরুর শিরায় প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজন হলে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপসংহার

বিশ্ব উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিশ্বের এক অঞ্চলের রোগগুলি অন্য অঞ্চলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন রোগের বিস্তার বিশেষ করে Vector বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। লাম্পি স্কিন ডিজিজ তার একটি বাস্তব উদাহরণ। লাম্পি স্কিন ডিজিজ বাংলাদেশের খামারীদের জন্য একটি নতুন রোগ। আতংকিত না হয়ে, বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে, উত্তম খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

১) ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ
২) ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ
৩) ডাঃ মোঃ আবু ইউসুফ, প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ
৪) ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান, ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন গবেষণা বিভাগ
৫) ডাঃ মোঃ জুলফিকার আলী, প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ
৬) ডাঃ মোঃ মাহমুদ হাসান, প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ
৭) ডাঃ মোঃ জাকির হাসান, প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ

বিএলআরআই প্রকাশনা-৩০৯

অর্থায়নে : বাংলাদেশে লাম্পি স্কিন রোগ অনুসন্ধান প্রকল্প

প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১
টেলিফোন: ০২-৭৭৯১৬৯০, ফ্যাক্স: ০২-৭৭৯১৬৭৫
ই-মেইল: mgias04@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.blri.gov.bd